মার্কিন ছোটো গল্পকার উইলিয়াম পোর্টার তাঁর ছদ্মনাম ও হেনরি নামে পরিচিত। নিজেকে আড়ালে রেখে রচনা সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়েছিলেন। জন্ম উত্তর ক্যারোলিনার গ্রিনসবরোতে। বাবা অ্যালগারনন সিডনি পোর্টার চিকিৎসক ছিলেন। ছোটোবেলায় মাকে হারান। বড়ো হয়েছিলেন ঠাকুমার কাছে। ছোটো থেকেই ছিলেন বইপোকা। কালজয়ী সাহিত্য, উপন্যাস পড়তেন সব। মার্কিন জীবনশৈলী নিয়ে প্রায় ছ'শো গল্প লিখেছেন হেনরি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পের বই 'দ্য গিফট্ অফ ম্যাগি', 'দ্য র‍্যানসম অফ রেড চিফ', 'দ্য কপ অ্যান্ড দ্য অ্যানথেম' ইত্যাদি।

বুধবার, ২৪ ভাদ্র ১৪২৬ ■ ৪০ বর্ষ ■ ১১৫ সংখ্যা

ভালোর চেয়ে বেশি খারাপ

সব কিছুরই ভালো এবং খারাপ দুটি দিকই রয়েছে। কিন্তু কখনো-কখনো খারাপের পাল্লা এতটাই ভারী হয়ে যায় যে তা ভালোর দিকটাকে প্রায় নস্যাৎ করে দেয়। সাদাকে একবারে ঝাপসা করে দেয় কালো। পুলিশের অবস্থাটাও কার্যত সেই রকমই। প্রচুর ভালো কাজ করলেও কিছু কাজ এতটাই কালো যে তা পুলিশের সুনামকে বা তাদের সাদা দিকটাকে স্পষ্ট হতে দেয় না। শিলিগুড়ির পুলিশের পরিস্থিতি দেখলে বিষয়টি অনেক পরিষ্কার হবে। এমন বহু দুষ্কর্ম অতীতে হয়েছে যার রহস্যের সমাধান পুলিশ খুব দ্রুত করায় সেই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি বহু ঘটনার কোনো কিনারা করতেই ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। ফলে ওইসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলি এখনও বিচার পায়নি। কখনো-কখনো কোনো অজ্ঞাত কারণে পুলিশ কোনো মামলাকে এমনভাবে সাজায় বা কোনো মামলার ভিত এতটাই দুর্বল হয়ে যায় যে দিনের পর দিন আদালতে ঘুরে ঘুরেও কোনো ইতিবাচক ফল পায় না সমাজ। এসব পুলিশের ব্যর্থতা হিসাবেই দেখা হয়।

গত ১৬ দিনে শিলিগুড়িতে ১৩টি চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও আইনশৃঙ্খলাজনিত আরও বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যেগুলি পুলিশের খাতায় অভিযোগ হিসাবে নথিভুক্ত হয়নি। তার মধ্যে শহরে মোটরবাইকের দাপট সংক্রান্ত একাধিক ঘটনা রয়েছে। গত ১৬ দিনে একটি বড়ো ধরনের ডাকাতি সহ ১৩টি চুরি, ছিনতাইয়ের যে ঘটনা ঘটেছে তার কোনোটিরই রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনো ঘটনাতেই দুষ্কৃতীদের ধরতে পারেনি। আর একটি ফিনান্স সংস্থার শিলিগুড়িতে একটি শাখায় যে বড়োসড়ো ডাকাতি হয়েছিল সেই রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে স্পষ্টতই পথ হারিয়ে ফেলেছে পুলিশ। এসব ক্ষেত্রে পুলিশের মুখে অতি পরিচিত একটি বাক্য শোনা যায়– 'তদন্তের স্বার্থে এখনই বা এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।' বাস্তবিকই পুলিশের কাছে তার চেয়ে বেশি কিছু বলার সম্ভবত থাকেও না। ফিনান্স সংস্থার ডাকাতির ঘটনায় দুষ্কৃতীদের এখনও পর্যন্ত শনাক্ত করাই যায়নি। এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি যেমন অনায়াসে লুঠ হয়ে গেল তারপর পুলিশের দক্ষতা নিয়ে যদি কেউ ধারাবাহিক প্রশ্ন তুলে থাকে তাকে কি খুব অন্যায় কাজ বলা যায়? সাধারণ মানুষের উদবেগের জায়গাও অবশ্যই রয়েছে।

এছাড়াও পুলিশের আরও একটি কালো দিক রয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে হামেশাই বেআইনিভাবে টাকা নেওয়ার (যাকে সাদা বাংলায় ঘুস বলা হয়) অভিযোগ আছে। ঘুস অবশ্য এমনই জঘন্য একটা বিষয় এবং তা এতটাই সর্বগ্রাসী যে এই নীচ মানসিকতায় দুষ্ট নয় এমন মানুষ খোঁজা আর কম্বলের লোম বাছতে যাওয়া কার্যত একই বিষয়। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি ব্লকে অভিযোগ উঠেছে, পাসপোর্ট তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট নথি পুলিশের তরফে তখনই জমা দেওয়া হয় যখন তাদের চাহিদা অনুযায়ী অর্থ মেলে। নতুবা নথিপত্র আটকে রেখে দেওয়া হয়। পাসপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে কারও সম্পর্কে তথ্য যাচাই করে জমা দেওয়ার পুলিশি প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। আর তারই সুযোগ নেয় পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা। বাস্তবে এই অভিযোগ শুধু খড়িবাড়ির পুলিশের বিরুদ্ধেই নয়, রাজ্যের সর্বত্রই পুলিশকে এমন অভিযোগ শুনতে হয়। টাকা না দিলে পাসপোর্টও মিলবে না, এটা এখন অতি বড়ো সত্য। অথচ কোথাও কোনো পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এই কারণে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এমন নজির নেই।

ঠিক এই জায়গায় পুলিশের মুখে আরও একটি অতি পরিচিত বাক্যবন্ধ শোনা যায়– অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ কোনো পুলিশকর্মীর এহেন অপকর্মের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ না জানালে কর্তারাও কিছু দেখেও না দেখেই থেকে যাবেন। অথচ সেই পুলিশই কখনো-কখনো অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন হয়তো তাদের মনে পড়ে যায় সুয়োমোটো বা স্বতঃপ্রণোদিতভাবেও মামলা দায়ের করা যেতে পারে। অন্য সময় সেই তত্ত্বটাই বিস্মৃত থাকে পুলিশ। আর এইসব কারণেই পুলিশ ভালো কাজ করলেও কিছু কুকর্মের জন্য সেসবও মানুষ দ্রুত ভুলে যায়। বহিরঙ্গের সাদা পোশাকের মতো পুলিশের সব কাজই যদি সাদা হত তাহলে এই সমাজও স্বচ্ছ হতেই পারত, যা কিনা সাধারণ মানুষের শান্তিতে থাকার প্রধান চাহিদা।

অমৃতধারা

যাঁহারা প্রাচীনপন্থী, তাঁহাদের দৃষ্টিতে আদর্শবলিতে শুধু আত্মসমর্পণই বুঝায়। কিন্তু তোমাদের আদর্শ হইল সংগ্রাম। ফলে জীবনকে উপভোগ করি আমরাই, তোমরা কখনই পার না। তোমরা সবসময় আরও ভালো কিছুর জন্য তোমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করিতে সচেষ্ট, কিন্তু ঈপ্সিত পরিবর্তনের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সাধিত হওয়ার আগেই তোমরা মরিয়া যাও। পাশ্চাত্যের আদর্শ হইল–কোনো কিছু করা এবং প্রাচ্যের আদর্শ হইল–সহ্য করা। 'করা' এবং 'সহ্য করা'–এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়েই পূর্ণ জীবন গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা কখনও সম্ভব নয়।

আমাদের সমাজে এটা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত যে, মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য আমাদের জীবন অনেক বিধিনিষেধের অধীন। এগুলি সৌন্দর্যহীন মনে হইলেও ইহা শক্তি ও আলোক-প্রদ। আমাদের সমাজের উদারপন্থীরা সমাজের শুধু কুৎসিত দিকটা দেখিয়া ইহাকে দূরে বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে যাহা প্রবর্তন করিলেন, তাহা তেমনি খারাপ। তারপর নতুন প্রথাগুলির শক্তি লাভ করিতে পুরাতন প্রথাগুলির মতোই দীর্ঘ সময় লাগিবে। পরিবর্তন করিলেই ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয় না, বরং উহা দুর্বল ও পরিবর্তনের অধীন হইয়া পড়ে। তবে আমাদের সব সময়ই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নিজস্ব করিয়া লওয়ার মধ্য দিয়াই ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়তর হয়।

–স্বামী বিবেকানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২৪০৩

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। মহিষাসুর ১৬ হাতের এই দেবীর পুজো করে বর পেয়েছিলেন ৫।পরিশ্রমের বিনিময়ে পাওয়া অর্থ ৬। সময়মতো উপস্থিত হতে না পারা ৮। পায়ের অলংকার ৯। জনতার সঙ্গে যে ফলের সম্পর্ক আছে ১১। দেবী দুর্গারও নাম আবার একটি ফুলেরও নাম ১৩। বিনাশ বা সমূলে ধ্বংস ১৪। আড়ি পাতা বা লুকিয়ে শোনা।

উপর–নীচ : ১। দেবী উগ্রচণ্ডার আটজন যোগিনীর একজন ২। যে একক দিয়ে সোনা, রুপোর আগে মাপা হত ৩। যেখানে বৈষ্ণোদেবীর মন্দির আছে ৪। পণ্ডিত শিবকুমার শর্মার নাম যে বাজনার সঙ্গে জড়িত ৬। সুন্দর করে বললে গ্রীবাদেশ, আসলে টুঁটি ৭। যে ঘরে পুরুষদের ঢোকা বারণ ৮। মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করাই যাদের পেশা ৯। যে গাছে তোতা পাখি বসে বলে ছড়া আছে ১০। চণ্ডীপাঠের সময় দেবী দুর্গাকে যে নামে অনেকবার নমস্কার করা হয় ১১। শুম্ভ–নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন যে দেবী ১২। সাময়িক বিশ্রাম বা অবকাশ ১৩। তবলা–ডুগির এবং জলের কলসির নীচে থাকে।

সমাধান ■ ২৪০২

পাশাপাশি : ১। জলপাই ৩। হিমজা ৫। খরাকবলিত ৬। মিশেল ৭। নায়িকা ৯। বাহনকেশরী ১২। হীরক ১৩। নিরাশ্রয়।

উপর–নীচ : ১। জন্মভূমি ২। ইন্দিরা ৩। হিজাব ৪। জান্নাত ৫। খল ৭। নারী ৮। কার্তিকেয় ৯। বারাহী ১০। নরক ১১। শকুনি।

এত শক্তি সুনীল কোত্থেকে পেত, ভাবলে বিস্ময় আর রোমাঞ্চ হয়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষাকে চারদিক থেকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে, সুনীল এই ব্যাপারটাকে মোটেই ভালোভাবে নেয়নি। ও লড়াইয়ে নেমেছিল। কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনায় ভয় পেয়ে ও পিছিয়ে যায়নি

আরও একটা জন্মদিন পেরিয়ে গেল সুনীলের।

সাতই সেপ্টেম্বর ছিল সুনীলের জন্মদিন। সুনীল, মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। সুনীল ছিল আমার বহুদিনের বন্ধু। সুনীল বেঁচে থাকলে সেই বন্ধুত্বের বয়স খুব একটা কম হত না। নয় নয় করে প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই হয়ে যেত। এতদিনের ভাবসাব আমাদের, কিন্তু এই সম্পর্কে কখনও কোনো ধুলোময়লা লাগেনি। আমাদের বন্ধুত্ব একটুও মলিন হয়নি। সম্পর্ক অটুট ছিল সুনীলের চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত।

সুনীল এবং আমি––আমরা দু'জনেই পড়তাম আমহার্স্ট স্ট্রিট সিটি কলেজে। সে ১৯৫২–৫৩ সালের কথা। সুনীলের ছিল অর্থনীতিতে অনার্স, আমার বাংলায়। আমি কিন্তু ফেলটু। কলেজে সুনীল আমার এক ক্লাস ওপরে পড়ত। কবি এবং নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও ছিল সুনীলের সহপাঠী। কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত পড়ত আমার সঙ্গে। এক ক্লাস উপরে পড়লে কী হবে, সুনীলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে সময় লাগেনি।

কলেজ জীবনে আমরা দুজনেই ছাত্র–রাজনীতি করতাম। ছিলাম ছাত্র ফেডারেশন বা এসএফআই–এর সমর্থক। ছাত্র ফেডারেশনের নানা কর্মসূচিতে আমরা যোগ দিতাম। মিটিং মিছিল হলেই আমরা দৌড়াতাম। অনেক বছর আগের কথা, কিন্তু বেশ মনে পড়ে, আমি আর সুনীল বহু আন্দোলনে শামিল হয়েছি। ওই সময়ের অনেক কথা সুনীল মজা করে লিখেওছে পরবর্তী সময়ে।

সুনীল কথাবার্তা বেশি বলত না, মৃদুভাষী, কিন্তু জেদ ছিল প্রচণ্ড। ভিতরে–ভিতরে সাহস আর তেজে টগবগ করে ফুটত। যেটা ভালো মনে করত, তা করে ছাড়ত। দমে যাওয়ার পাত্র সুনীল ছিল না। আমরা যখন ছাত্র আন্দোলন করতাম, তখন লক্ষ করেছি, সুনীল সামাজিক নানা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অনেক সময় রুখে দাঁড়াত। মাথা নিচু করত না। শেষ জীবন পর্যন্ত সুনীলের মধ্যে সেই ব্যাপারটা ছিল। অনেকে যখন অনেক ব্যাপারে মুখ খোলে না, সুনীল কিন্তু সরব হয়ে উঠত। সুনীল অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেনি। 'পলায়ন' শব্দটা ওর চরিত্রে ছিল না। এই ব্যাপারটা আমাদের দুজনেরই আরেক বন্ধু, শক্তি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেও দেখেছি।

'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সুনীলের কাব্য–আন্দোলনের কথা কারও অজানা নয়। কৃত্তিবাস পত্রিকার আমি ছিলাম অনুরাগী পাঠক, কিন্তু আমি নানা কারণে ওদের দলে ভিড়তে পারিনি। সুনীল এবং শক্তি কৃত্তিবাসের জন্য সবসময়ই আমার কাছে লেখা চাইত। গোড়ার দিকে লেখালিখির ব্যাপারে আমার খুব একটা আত্মবিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আমার এই দুই বন্ধুর কাছ থেকে এমনই প্রশ্রয় আর সমর্থন পেতাম যে, মনে মনে বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতাম। পারি বা না পারি নিয়মিত লিখতে ইচ্ছে করত, লিখতামও হয়তো। ওদের এই সদাশয়তার কথা ভোলা যাবে না। প্রসঙ্গত, একটা ঘটনার কথা জানাই। একবার কোনো একটা কাজে আমি নিউ মার্কেটে গিয়েছি। হঠাৎ কানে এল কেউ আমাকে ডাকছে : এই পুলু, এই পুলু। এখানে কে আমার ডাকনাম ধরে ডাকছে রে বাবা! আমি চমকে এদিকে–ওদিকে তাকাতে দেখি শক্তি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কাছে এগিয়ে যেতেই শক্তি বলে উঠল, 'কিছু আছে?' মানে কবিতা আছে কিনা। তখন প্রায়ই পকেটে কবিতা থাকত। ওর পকেটেও যে থাকত, তা বলাই বাহুল্য। সেদিন সেই ভরদুপুরে, খটখটে রোদের মধ্যে মনোহর দাস তড়াগে বসে দু'জনের পকেটের কবিতা পড়া হল।

আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশের পিছনেও সুনীল ও শক্তির বড়ো ভূমিকা ছিল। ওরা বলেছিল, 'তুমি তো আর নিজের টাকায় কবিতার বই বার করবে না, তার দরকারও নেই, কলেজ স্ট্রিটের একটি প্রথম সারির প্রকাশনা সংস্থার সুধাংশুশেখর দে তোমার শ্রেষ্ঠ কবিতা বার করবেন ঠিক করেছেন।' আমি শ্রেষ্ঠ কবিতায় বিশ্বাস করি না, কোন কোন কবিতা শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পড়ে সে সম্পর্কে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণাও ছিল না। ফলে আমি খুব একটা আগ্রহ দেখাইনি, সত্যি বলতে কী, আমার দ্বিধা ছিল। কিন্তু সুনীল তো ছাড়বার পাত্র নয়। আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র কবিতাগুলি সে অত্যন্ত যত্ন আর আন্তরিকতার সঙ্গে নির্বাচন করে দিয়েছিল। এই ভালোবাসার কথা কি কখনও ভুলতে পারব?

কবিতার জন্য শক্তি আর সুনীল কম রক্তপাত করেনি। সত্যি বলতে, কবিতার জন্য ওরকম উৎসর্গীকৃত প্রাণ দেখা যায় না। অন্তত আমি দেখিনি। সুনীলের 'আমি কিরকমভাবে বেঁচে আছি' এক অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ। এই কবিতার বইটি, আমার ধারণা, বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দৈনিক পত্রিকার কাজে যোগ দেওয়ার পর সুনীলকে দু'হাতে গদ্য লিখতে হয়েছে। পেশাগত কারণে সুনীল একটু বেশিই লিখেছে। সুনীলের গদ্যের স্বাদই আলাদা।

সুনীল ছিল মৃদুভাষী, কিন্তু জেদ ছিল প্রচণ্ড। ভিতরে–ভিতরে সাহস আর তেজে টগবগ করে ফুটত। যেটা ভালো মনে করত, তা করে ছাড়ত। দমে যাওয়ার পাত্র সুনীল ছিল না। আমরা যখন ছাত্র আন্দোলন করতাম, তখন লক্ষ করেছি, সুনীল সামাজিক নানা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অনেক সময় রুখে দাঁড়াত। মাথা নিচু করত না। 'পলায়ন' শব্দটা ওর চরিত্রে ছিল না। এই ব্যাপারটা আমাদের দুজনেরই আরেক বন্ধু, শক্তি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেও দেখেছি।

ওর অসাধারণ বহু গদ্যরচনার সজীবতা ও সৌন্দর্য আমাকে মোহিত করেছে। চিরকাল। সব গদ্য হয়তো সমান মানের হয় না, কারুরই হয় না, কিন্তু ওর প্রতিটি গদ্যই বলার গুণে আমাদের মনোযোগ আদায় করে নিয়েছে। ওর 'আত্মপ্রকাশ' তো এক অসামান্য রচনা। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন বলেই নয়, সত্যি–সত্যিই অসাধারণ লেখা। এই যে কবিতা থেকে গদ্যের স্ফূরণ, এ তো বড়ো কম কথা নয়। সুনীল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। 'সেই সময়' লেখার কালে বিভিন্ন উপন্যাস, গল্প, কবিতা, শিশুসাহিত্য সুনীল দাপটের সঙ্গে লিখেছে। আসলে সুনীল অত্যন্ত বড়ো লেখক, সেজন্যই এই দুরূহ কর্ম এত সাবলীলভাবে করতে পারে।

বন্ধু সুনীলের অজস্র গুণ। একটা বড়ো গুণ তার অভিনয় ক্ষমতা। 'হরবোলা' প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় 'মুক্তধারা' নাটকে সুনীলের অভিনয় দেখেছি। চমৎকার। 'বুধসন্ধ্যা'র নাটকগুলিতেও সুনীলের অভিনয় খুবই প্রাণবন্ত। সুনীলের গানের গলাও সুন্দর। বহু আড্ডায়, আসরে ও গান গেয়ে বাহবা পেয়েছে।

'এক্ষণ' পত্রিকার সম্পাদনা করতাম যখন, সুনীলের সহায়তা পেয়েছি অকুণ্ঠভাবে। লেখার ব্যাপারে ও কখনও বিমুখ করেনি। বলতে ভালো লাগছে, 'খরা', 'মুখাগ্নি'র মতো বেশ কয়েকবার সেরা গল্প সুনীল এক্ষণেই লিখেছিল।

সুনীলের আরও একটা ব্যাপারে অনেকের মতো আমিও গর্ব করতে পারি। ও যে একজন সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিক, তা ওর নানা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে। বাংলাভাষাকে চারদিক থেকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে, সুনীল এই ব্যাপারটাকে মোটেই ভালোভাবে নেয়নি। ও লড়াইয়ে নেমেছিল। কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনায় ভয় পেয়ে ও পিছিয়ে যায়নি। ছাত্রজীবনে ওর মধ্যে যে সাহস, তেজ, দৃঢ়তা দেখেছি শেষ বয়সেও সেই গুণগুলো হারিয়ে যেতে দেখিনি। বরং আরও বেশি করে তার পরিচয় পেয়েছিলাম। এত শক্তি সুনীল কোত্থেকে পেত জানি না।

ভাবলে সত্যিই একই সঙ্গে বিস্ময় আর রোমাঞ্চ হয়!

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

মিড–ডে মিলের আয়োজনে পড়াশোনায় ব্যাঘাত

দরিদ্রনারায়ণ সেবাই যদি করতে হয় তাহলে তা মন্দির বা মসজিদে করা হোক, অযথা স্কুলে তার আয়োজন করে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটাবেন না। শিক্ষককুলের অনেক রকম প্রতিবাদ লক্ষ করা গেলেও এনিয়ে কোনো প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। অথচ শিক্ষকরা সকলেই জানেন যেসব স্কুলে মিড–ডে মিল খাওয়ানো হয়, সেখানে পড়াশোনার হাল তলানিতে পৌঁছেছে। কিন্তু তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। কেননা তাদের সন্তানরা তো আর সে সব স্কুলে পড়ে না। সম্প্রতি স্কুলের মিড–ডে মিল নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে। সরকার এর জন্য যত টাকাই বরাদ্দ করুক না কেন, যাদের হাত দিয়ে তা খরচ হয় তারা যে নিজেদের জন্য 'টু পাইস' রেখেই তা করেন, এর ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

স্কুল হল পাঠদান ও পাঠগ্রহণের জায়গা। এখানে যদি নিত্যনতুন রুটিনে খাওয়ার আয়োজন চলতে থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন বসবে কেন? কোনো বাবা–মা'ই সন্তানকে শুধু পেট ভরার জন্য ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্কুলে পাঠান না। বরং সরকার থেকে যত টাকা মিড–ডে মিলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, তার চেয়ে কয়েকগুণ টাকা সন্তানদের পকেটে গুঁজে দেন। আর যাঁদের এটুকু সামর্থ্যও নেই, তাঁদের সন্তানরা হয় শিশুশ্রমিকের কাজ করে নতুবা ভিক্ষাবৃত্তি। সরকার কি আইন করেও এসব নাবালককে স্কুলমুখী করতে পেরেছে? তাহলে পড়াশোনার বারোটা বাজিয়ে স্কুলে মিড–ডে মিলের কি প্রয়োজন? মিড–ডে মিল চালুর আগে স্কুলে পড়াশোনার হাল কী ছিল, আর এখন কী হয়েছে! এই মিড–ডে মিল খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া যুবকরা কী কম্মের যোগ্য হতে পারে তা মুখ্যমন্ত্রী ভালোই জানেন। তাই তো তিনি পুজো প্যান্ডেলগুলিতে ৭০ কোটি টাকা উড়িয়ে দিয়ে কোন বেকারের পেটে কতটা ক্ষুধা তা ওই টাকা ধরার কেরামতি দেখে অনুমান করতে চাইছেন।

উত্তম বাছার
ফকদইবাড়ি, শিলিগুড়ি।

কোচবিহারে ত্রিশঙ্কু সমস্যা

কোচবিহার শহরের উন্নয়নে ত্রিশঙ্কু সমস্যা– পূর্ত দপ্তরের সড়ক সম্প্রসারণ, পুরসভার ভূগর্ভস্থ জলের পাইপলাইন বসানোর পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের লাইন বসানো। পুরসভা পাঁচ–ছয় বছর ধরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মাটির নীচে জলের পাইপ বসিয়ে চলেছে। ফলে বিএসএনএলের অপটিকাল ফাইবার তার ছিঁড়ে ফেলে সরকারি টেলিফোন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ এখনও জল সরবরাহ করা হল না। পূর্ত দপ্তর কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাস্তাগুলো ম্যাস্টিক করে ঝাঁ–চকচকে করে দিল। বছর না ঘুরতেই বিদ্যুৎ দপ্তর সেই রাস্তা খুঁড়ে বিদ্যুতের তার মাটির নীচে বসিয়ে দিল। এরফলে সব রাস্তা ভেঙে চুরমার হয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেল। এবার পূর্ত দপ্তর রাস্তা চওড়া করার কাজে নেমে পড়ল। জলের লাইন খুঁড়ে সরানো শুরু হল। এভাবে সরকারি টাকার অপচয় হচ্ছে। কারণ, যে এজেন্সি কাজ করেছে তাদের আর সরকারি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ ঠিক রাখার দায়িত্ব থাকল না। পরিকল্পনা না থাকার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ হচ্ছে।

কোচবিহারের রাস্তাগুলো পূর্ত দপ্তরের অধীনে। কাজেই তারই উচিত সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। শহরের উন্নয়ন হবে, তার জন্য রাস্তা সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী। রাস্তার সঙ্গে জড়িত নিকাশিনালা, পানীয় জলের পাইপ, টেলিফোন ও বিদ্যুতের কেবল। সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সময় রাস্তার দু'পাশে চারটি করে কংক্রিটের ডাক্ট করা হলে অর্থের অপচয় অনেক কমে যাবে আর প্রত্যেক দপ্তরকে ওই ডাক্ট ব্যবহার করার জন্য পূর্ত দপ্তরের কাছে অনুমতি নিতে হবে। ব্যাপারটা সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর ভেবে দেখতে পারে।

অনিমেষ সরকার
অরবিন্দ লেন, নরনারায়ণ রোড, কোচবিহার।

গর্বিত দেশ

চাঁদের মাটিতে স্পর্শ করে ইতিহাস গড়ল চন্দ্রযান–২। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক। এই প্রথম কোনো দেশ চাঁদের দক্ষিণ মেরু স্পর্শ করল। চন্দ্রযান–২ সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছে, এতে ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের নিরলস প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

বেহাল রাস্তায় সমাজবিরোধীদের দাপট

রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশের রাস্তাটির বেহাল দশা। রাস্তাটি এতটাই খারাপ যে, যানবাহন তো দূরের কথা, হেঁটে চলাচল করাও প্রায় অসম্ভব। অথচ এই প্ল্যাটফর্মেই কলকাতার ট্রেন যাওয়া–আসা করে। প্রতিদিন প্রচুর মানুষ নাকাল হন। পুরসভা, পূর্ত দপ্তর এবং রেল– এই তিন বিভাগের কাজিয়ায় রাস্তা সারাই হয় না। এই রাস্তায় টোটোচালকদের কাছ থেকে জোর করে দুর্গাপুজো, কালীপুজোর চাঁদা আদায় করা হয়। সন্ধে নামার পরেই এই রাস্তা সমাজবিরোধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। রাত যত বাড়ে, এলাকাটি যেন হয়ে ওঠে মিনি চম্বল। কি না হয় এই এলাকায়– দেহ ব্যবসা, নেশার ঠেক, ছিনতাই– সব মিলিয়ে চলে নরক গুলজার! অথচ এই রাস্তায় কোনো পুলিশি নজরদারি নেই। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ বা রেলপুলিশ কেউ এখানে সুরক্ষা দেন না। এই সুরক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে রায়গঞ্জ থানা এবং রেল পুলিশের মধ্যে চাপানউতোর চলে। এছাড়া এই এলাকায় প্রচুর শুয়োরও দেখা যায়, যারা সোয়াইন–ফ্লু ছড়ায়। এই এলাকাটি আমজনতার কাছে 'ওপেন টয়লেট'ও বটে!

সামিম আখতার বানু, রায়গঞ্জ।

যাত্রী প্রতীক্ষালয়

উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এশিয়ান হাইরোডের ফালাকাটা–বীরপাড়া সংযোগস্থলকারী জটেশ্বরের হাইরোড সম্প্রসারণের কাজ সদ্যসমাপ্ত হয়েছে। জনকল্যাণে যানবাহনের গতিবেগ রোধে ডিভাইডারও বসেছে। পাশাপাশি যাত্রীদের সুবিধার্থে জটেশ্বরে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের গুরুত্বও দেখা দিয়েছে, যার সুবিধা রাস্তা সম্প্রসারণের আগেও যাত্রীরা ভোগ করেছেন। এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নির্ঝর দত্ত
জটেশ্বর, আলিপুরদুয়ার।

আশ্বাস স্টেশন ম্যানেজারের

ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত হেলাপাকড়ি অঞ্চলে অনেকদিন ধরেই বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। বিদ্যুৎ পরিসেবার দাবিতে হেলাপাকড়ি নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে মিছিল করা হল। মঞ্চের উদ্যোগে ভোটপাট্টি বিদ্যুৎ অফিসের সামনে বিক্ষোভ শুরু হল। অবশেষে স্টেশন ম্যানেজার ভোটপাট্টি পাওয়ার স্টেশন তৈরির পরিকল্পনার কথা জানালেন। এই পরিকল্পনা সফল হলে আমাদের সমস্যা দূর হবে। আপাতত তাঁর আশ্বাসই সব।

আদিত্য সেনগুপ্ত, ছাত্র
হেলাপাকড়ি পদমতি ইউনিয়ন রহিমুদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়
হেলাপাকড়ি, জলপাইগুড়ি।

বেহাল দশা শৌচালয়ের

ইসলামপুর পুরসভা কর্তৃক নির্মিত ইসলামপুর শহরের চৌরঙ্গি মোড়ে অবস্থিত শৌচালয়টির এখন বেহাল দশা ও আগাছায় ভরে আছে। ফলে সাধারণ মানুষকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। অথচ পুরসভা শৌচালয়টিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার দিকে কোনো নজরই দেয়নি। প্রশাসনের এমন নীরবতা দেখে অবাক লাগে। এই শৌচালয়টিকে সুলভ ও ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে ইসলামপুর পুরসভা ও সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

ইকো পার্কের বেহাল দশা

আলিপুরদুয়ার শহরের প্রাণকেন্দ্র প্যারেড গ্রাউন্ডকে কেন্দ্র করে যে ইকো পার্কটি গড়ে উঠেছে, বর্তমানে তা দেখাশোনার অভাবে খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। পার্কের ভেতরে যত্রতত্র গবাদিপশুর বিচরণ ও তাদের মলমূত্র পড়ে থাকার দরুন আমরা যারা প্রাতর্ভ্রমণে কিংবা সান্ধ্যভ্রমণে আসি, তাঁদের পক্ষে চলাফেরা করাই দায় হয়ে পড়ে। এছাড়া বেশকিছু জায়গায় গাছ–গাছালির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। মাঠের এককোনায় পড়ে থাকা মুক্তমঞ্চটিও বিশেষভাবে কোনো কাজে না লাগায় একপ্রকার অনাদৃত। বিপুল অর্থব্যয়ে গড়ে ওঠা সরকারি সম্পত্তিটির চূড়ান্ত অবহেলায় একজন আলিপুরদুয়ারবাসী হিসেবে গভীরভাবে মর্মাহত। আশা করি প্রশাসন এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ করবে।

সুমন মুখোপাধ্যায়
নেতাজি রোড, কলেজপাড়া, আলিপুরদুয়ার।

প্লাস্টিক বর্জন

প্রধানমন্ত্রী প্লাস্টিক বর্জনের ডাক দিয়েছেন। প্লাস্টিক উৎপাদনের কারখানা বন্ধ না হলে প্লাস্টিকের ব্যবহার চলতেই থাকবে। তাই প্লাস্টিক কারখানা অবিলম্বে বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আশা করছি। কিন্তু যখন সব রাজনৈতিক দল বড়ো ব্যবসায়ীদের ডোনেশনে চলে, তখন ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করাই সরকারের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তাই প্লাস্টিক উৎপাদন কারখানা বন্ধের সৎ সাহস মোদি সরকারের নেই। প্লাস্টিক বর্জনের ডাক লোক দেখানো ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছুই না।

আব্দুল জলিল সরকার, শিক্ষক
বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি, কোচবিহার।